# পরিচয় রাজনীতি ও এন. আর. সি. – সি. এ. এ.

*দেবারুণ মন্ডল*

পরিচয় রাজনীতির সঙ্গে এ মুহূর্তের ভারতবর্ষ অত্যন্ত পরিচিত। পরিচয় রাজনীতি কি বা কেন? CAA বা NRC-এর ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি পরিচয়ের রাজনীতি হঠাৎই এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কীভাবে? এ সম্পর্কে বোঝার জন্য আমাদের সবার আগে পরিচয় রাজনীতি বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে।

'পরিচয়'- অর্থাৎ এই যে 'আমি' এই আমিটার অস্তিত্ব কী? এই আমি আসলে কে? মানুষের ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম নিঃশ্বাস থেকেই – সে তার পিতা-মাতা বা পরিবারের পরিচয় বহন করা শুরু করে। যার সঙ্গে পরবর্তীতে যুক্ত হয় তার রাষ্ট্রীয় পরিচয় (ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি)।

'রাজনীতি' শব্দটি সম্পর্কে অবগত নন এমন বাঙালী খুঁজে পাওয়া প্রকৃতই দুষ্কর। এই তথাকথিত রাজনীতিই যখন হয়ে ওঠে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী মানুষ কেন্দ্রিক, ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত, এমনকি নারী বা পুরুষের বিভাজন প্রভৃতিও যখন এর মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে যায়, তখন সেই রাজনীতি জন্ম দেয় 'পরিচয় রাজনীতির'। পরিচয় রাজনীতি শুধুমাত্র এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভাষা, জনগোষ্ঠী সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের বিভাজন, নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক চিন্তাধারা প্রভৃতি সবকিছুর উপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে 'পরিচয় রাজনীতি'। শুরু হয় বাকীদের থেকে নিজেকে বা নিজেদের আলাদা করার খেলা ।

Society Language and Culture

মুম্বই শহরের মেয়েরা ২০১৭ সালে অফিস টাইমে 'লেডিস স্পেশাল' বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানাতে থাকেন। বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও সামিল হন তাঁরা। এই আন্দোলন মহিলা পরিচয়কে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা একটি 'পরিচয় রাজনীতির' জন্ম দেয়।

এছাড়া, দলিতদের অধিকারের দাবিতে 'ভীমা–কোরেগাঁও আন্দোলন' কিংবা অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া "পিজঁরা-তোড় আন্দোলন" এই সংগ্রামগুলিও বিভিন্ন সময় ভারতবর্ষের মাটিতে নানারকম জাতিভিত্তিক Identity Politics – এর জন্ম দিয়েছে।

'পরিচয় রাজনীতি'- কে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হওয়া আন্দোলন সত্যিকারের পিছিয়ে পড়া সমাজকে কতখানি সাফল্য এনে দিতে পারে সে তর্ক আপাতত থাক। এখন আমরা দেখব এই পরিচয় রাজনীতির সঙ্গে CAA বা NRC কীভাবে সম্পৃক্ত?

CAA বা Citizenship Amendment Act- এর মূল ভিত্তি হল NRC বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জী। যার কাজ প্রথমে শুরু হয় অসমে এবং পরবর্তীকালে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই এই Act লাগু করতে বদ্ধপরিকর।

প্রথমেই বলে রাখি, কারা দেশের নাগরিক আর কারা তা নন এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ আইনকানুন বিস্তৃতরূপে দেওয়া আছে ভারতবর্ষের সংবিধানে। ভারতের সংবিধানে নাগরিকত্বের কোনো সংজ্ঞা বলা

নেই ঠিকই, তবে ৫ থেকে ১১ নম্বর ধারার মধ্যে কারা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে বিবেচ্য হবেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকেই ভারতীয় ঐতিহ্য মেনে (নাগপুর ঘরানার ঐতিহ্য নয়গ) এখানে হিন্দু–বৌদ্ধ–শিখ–মুসলিম–খ্রীস্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে আসছের। এমনকি আমাদের দেশের সংবিধানও রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রমানের জন্য কোনো ব্যক্তির ধর্মপরিচয়কে গুরুত্ব দেয়নি।

ভারতবাসীর এই মূল জাতীয় সত্তাতেই প্রথম আঘাত হানল NRC। দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন ভরা সমাবেশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেন – যারা লুঙ্গি পরে থাকে, তারা সবাই নাকী দুঃশাসনীয় হামলাবাজ, তখন এই উক্তি এক নতুন পরিচয় রাজনীতির জন্ম দেয়। যা একটি বিশেষ ধর্মকে (ইসলাম), তার মানুষকে অপরাপর ভারতীয় অস্মিতার থেকে পৃথক করে। এখানে পোষাক (লুঙ্গি) একটি বিশেষ জাতির মধ্যে থাকা ধর্মীয় পরিচয়কে চিহ্নিত করে।

ঠিক এভাবেই মানুষের খাদ্যভাস থেকে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জী-ও এক নতুন পরিচয় সত্তার জন্ম দেন, যখন তিনি সগর্বে চিনিয়ে দেন, যারা চিঁড়ে খায়, মোটামুটি তারা সবাই বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী।

বি. জে. পি. তার উগ্র হিন্দুত্ববাদী আত্মাটিকে নিয়ে ( যার পৃষ্ঠপোষক দাঙ্গাবাজ আর. এস. এস.) ভারতবর্ষের মাটিতে ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্নে প্রবল ব্যতিব্যস্ত। এরই একটি ধাপ CAA–NRC।

Society Language and Culture

আসলে সোজাসুজি 'মুসলিম' পরিচয়ের মানুষকে বাকী ভারতের আত্মা থেকে পৃথক করে দেওয়ার এক প্রবল ষড়যন্ত্র হল এই নাগরিকত্ব আইন। এই মহান ভারতরাষ্ট্র গড়ে ওঠার পিছনে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিচয়ের মানুষদের যাবতীয় অবদানকে নস্যাৎ করে, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে তোলাই এই একনায়কতন্ত্রী হিন্দুশাসকের প্রধান লক্ষ্য। যে ভারত সম্রাট আকবরের 'দীন–ই–ইলাহি'-র ভারত নয়, ব্রিটিশ মধ্যস্বত্বভোগী সাভারকারের স্বপ্নবিভোর 'হিন্দু মতাদর্শের' হিন্দুস্থান।

বিংশ শতাব্দী থেকে পৃথিবীর বুকে শুরু হওয়া পরিচয় রাজনীতির ভয়ঙ্করতম রূপটি দেখল ভারত, ২০১৯ সালের 'নাগরিকত্ব আইন' এর সংশোধনীতে।

২০১৯–এর সংশোধনে পরিষ্কার বলা হল - হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসী ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের যে সব মানুষ পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ১৪/১২/২০১৪-এর আগে এদেশে এসেছেন এবং লাগাতার পাঁচ বছর এদেশে বসবাস করছেন তাঁরা নাগরিকত্ব পাবেন। এই আইন অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

এই সংশোধনী থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুসলিম ধর্মালম্বীদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতিকে বাদ রাখা হল, যা ভারতবর্ষের সংবিধান প্রস্তাবনার 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নীতিটিরও পরিপন্থী। এখান থেকেই পরিষ্কার

আমাদের বর্তমান শাসকদের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি আসলে কী? মুসলিমদের তাদের ধর্মপরিচয়ের ভিত্তিতে দেশের মূলধারা থেকে পৃথক করে হিটলারের নাৎসি জার্মানির ইহুদিনিধনের কায়দায়, মানুষের মনে তীব্র ইসলামবিদ্বেষ তৈরী করা ও কোটি কোটি মানুষকে 'জেনোসাইড' করা।

এই আইনের সংশোধনীটি মুখে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির লক্ষ লক্ষ ধর্মীয় উৎপীড়িত মানুষদের নাগরিকত্ব দানের কথা বললেও কেন্দ্রীয় সরকারের (পড়ুন মোদী সরকারের) গোয়েন্দা বিভাগের হিসাব অনুযায়ী এই সংশোধনী আইনের সুবিধা পাবেন গোটা দেশে মাত্র ৩১৩১৩ জন।

অর্থাৎ, সরকারের মূল উদ্দেশ্যটি এখানেই অতি স্পষ্ট হয়ে যা। তাই সকল শ্রেণির আপামর ভারতবাসীকে এই পরিচয়ভেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত CAA–NRC-এর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই ভুয়ো পরিচয়ের রাজনীতিকে পরাজিত করতে হবে। তা না হলে 'বিবিধের মাঝে মিলন'-এর যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য হাজার হাজার বছর ধরে এই পূণ্য ভারতভূমির মাটিতে জারিত হয়েছে, সেই ঐতিহ্যশালী আদর্শটি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবে। আমার দেশ হয়ে উঠবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 'ফ্যাসিবাদী জার্মানি'।

কোনো জাত–পাত, ধর্ম বা লিঙ্গ ভেদের 'পরিচয় রাজনীতি' নয়, শ্রেণিহীন শোষিত মানুষই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে বিজয়ের ইতিহাস তৈরি করেছে, করছে ও ভবিষ্যতেও করবে।

*তথ্যসূত্রঃ*

Society Language and Culture

আনন্দবাজার পত্রিকা

এই সময় পত্রিকা ও

অন্যান্য পত্রপত্রিকা ও আন্তর্জাল

কৃতজ্ঞতা ও ঋনস্বীকারঃ শর্বরী জোয়ারদার